# ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন

# হযরত বিলাল (রাঃ)

হেলেনা খান

# ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন
# হযরত বিলাল (রাঃ)

হেলেনা খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম-ঢাকা

# ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রাঃ)

হেলেনা খান

**প্রকাশক**
এস,এম, রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

**চট্টগ্রাম অফিস ঃ**
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

**ঢাকা অফিস**
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

**প্রকাশকাল**
প্রথম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর, ২০০২
তৃতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল, ২০০৬

**মুদ্রাকর**
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

**প্রচ্ছদ অলংকরণ**
আরিফুর রহমান

**মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা**

**প্রাপ্তিস্থান**
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

---

**ISLAMER PROTHOM MUAZZIN HAZRAT BILAL (R) By:** Helana Khan, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Price : Tk. 45.00 US$ 2.00

**ISBN-984-493-067-7**

## উৎসর্গ

জান্নাতবাসী
আমার নানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী,
নানি মোসাম্মৎ আজিমন্নেছা,
মা মোসাম্মৎ ছুবেদুন্নেসা-সুন্দরী
বড় মামা আবদুল জলিল আহমদ,
ছোট মামা আবদুল জব্বার আহমদ ও
খালা সায়েদা খাতুন স্মরণে-

## ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ইসলামের প্রথম মুয়ায্‌যিন হযরত বিলাল (রাঃ) জীবনী গ্রন্থটি লেখার সময় আমেরিকায় বসবাসকারী অত্যন্ত ধার্মিক ও ধর্মানুশীলনে আন্তরিক, উচ্চশিক্ষিতা বেগম জাহেদা হাবীবুর রহমান এই মহান পুরুষের বেশ কয়েকটি তথ্যবহুল জীবনী গ্রন্থ সংগ্রহ করে, আমাকে এ পুস্তকটি রচনা করতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর উপকারের কথা আমি চিরদিন প্রীতির সাথে মনে রাখব।

---

যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি।


BILAL IBN RABAH — BY MUHAMMAD ABDUL-RAUF.

BILAL IN HADITH

হযরত বেলাল (রাঃ) — কে, এম, জি, রহমান
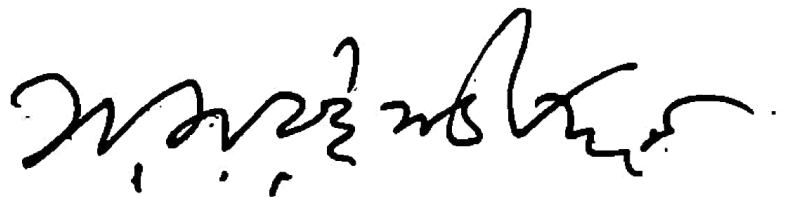
স্বর্গের জ্যোতিঃ — মিসেস সারা তয়ফুর

# প্রকাশকের কথা

সুদীর্ঘ পাঁচ যুগ ধরে হেলেনা খানের সাহিত্যাঙ্গনে বিচরণ। বাল্যকাল থেকেই তিনি লিখছেন। পরিণত বয়সে তাঁর লেখা অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি হ'য়েছে। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সমাজ তথা মানুষকে কিছু দিয়ে যাবার সদিচ্ছা পোষণ করেন। তাই তাঁর লেখা শুধুমাত্র সাময়িক আনন্দদায়ক কিছু নয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে কোনো না কোনো দিক দিয়ে মানুষের কল্যাণ, সত্য ও সুন্দরের দিক নির্দেশনা রয়েছে।

তাঁর রচিত "ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হযরত বিলাল (রাঃ)" এর জীবনী গ্রন্থটি ইসলাম ধর্মের একটি অত্যুজ্জ্বল দিকঃ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষকে সমুন্নত মর্যাদা প্রদান করার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন কাফ্রী ক্রীতদাসকে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হিসেবে সম্মানের উচ্চ শিখরে তুলে ধরা হয়েছিল, তাঁর সুদৃঢ় ঈমান ও মহৎ গুণাবলীর জন্য; তাঁর সামাজিক অবস্থা বিচার করে নয়।

হেলেনা খান হযরত বিলাল (রাঃ) এর অত্যুৎকৃষ্ট এই জীবনীটি লিখে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে ইসলামের ঔদার্য, মহানুভবতা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ জানাই। অতি দ্রুত ১ম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা আনন্দিত। এবার তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। পাঠক মহলে বইটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এ জন্যে আমাদের আয়োজন সার্থক এবং আল্লাহ'র দরবারে জানাই শোকরিয়া।

(এস, এম, রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

# সূচিপত্র

# সূচনা

ছোট্ট সোনামণিরা, তোমাদের অনেকের বাসাতেই তোমাদের প্রায় সমবয়সী ছেলে বা মেয়ে কাজ করে থাকে, তাইনা?

তারা গরিব বলে বাসায় বাসায় কাজ করে। মনে রেখো, তারা কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে করে বা চুরি করে উপার্জন করে না। নিজেদের ছোট্ট ক্ষমতায় যেটুকু পারে, সেইভাবেই তারা রোজগার করে। দুঃখ হয়, এরা গরিব। তাই বেচারারা স্কুলে যেতে পারে না।

এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রেখো। ইসলাম ধর্মে সকল জাতি, সকল ধর্ম, ধনী-গরিব সবার প্রতি সমান ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে ধনী ও গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর কাছে সেই ছেলে বা সেই মেয়েটির দাম অনেক বেশি যে সত্য কথা বলে, যে নম্র ও ভদ্র, বদমেজাজি নয়, যে গুরুজনদের কথা মেনে চলে, যে খাবার নষ্ট করে না, যে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হয়, যে কাউকে হিংসা করে না ও গরিবদের ঘৃণা করে না।

যারা খারাপ বা অসৎ কাজ করে ও আল্লাহ্‌কে মানে না, তারা অনেক টাকা পয়সার মালিক হলেও, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে সৎকাজ করে যে বিশ্বাসী গরিব, তার মূল্য অনেক বেশি।

এবার আমি তোমাদের কাছে এমন একজনের কথা বলব, যিনি ছিলেন খুবই গরিব। তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস অর্থাৎ কেনা গোলাম। বহু বছর আগে কোনো কোনো দেশের ধনীরা খুব গরিব লোকদের টাকা দিয়ে চিরদিনের জন্য কিনে নিত। সেই কেনা গোলামদের তারা গরু, ভেড়া, ছাগল অর্থাৎ পশুর মতো ব্যবহার করত। তাদের মানুষ বলেই মনে করত না। তাদের জীবন বড়ই দুঃখে কাটত।

আমি যে কেনা গোলামের কথা বলছি, তিনি আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে, সৎ ও আন্তরিক কাজের কারণে অতি সামান্য ক্রীতদাস থেকে অনেক বড় হয়েছিলেন, গভর্ণর হয়েছিলেন। তাঁর নাম হযরত বিলাল (রাঃ)।

# হযরত বিলালের (রাঃ) পরিচিতি

সে বহু বছর আগের কথা। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) র জন্মের (৫৭০ খ্রিঃ) বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আফ্রিকা মহাদেশের আবিসিনিয়ায় (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) খুব গরিব এক কাফ্রী দম্পতি ছিলেন। স্বামীর নাম রাবাহ্ ও স্ত্রীর নাম হামামা। তখনকার দিনে আবিসিনিয়ার ধনীরা গরিবদের যেন মানুষ বলেই গণ্য করত না। রাবাহ্ ও হামামাকে আবিসিনিয়ার দাস ব্যবসায়ীরা মক্কাবাসী জুমাহ্ গোত্রের কোনো এক ধনীলোকের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়।

এই ক্রীতদাসেরা একবার বিক্রি হয়ে গেলে কেবলমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সে মনিবের কাছ থেকে রেহাই পেত না। সারাটা জীবন ধরে মনিবের আদেশ আর বিধি নিষেধের মধ্যেই তাদের দিন কাটাতে হতো। খাটতে খাটতে তাদের জান বেরিয়ে যাবার মতো হলেও মনিবদের মনে একটুও দয়া হতোনা। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে যদি কোনো কেনা গোলাম মরেও যেত, তাহলে তার মনিব আপসোস করত তার দাম দিয়ে কেনা জিনিসটার জন্য, মানুষটির জন্য নয়।

ক্রীতদাস রাবাহ্ ও হামামার ঘরে মক্কার এক গ্রামে একটি শিশুর জন্ম হয়। ঐতিহাসিকদের মতে ৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। মা-বাবা শিশুটির নাম রাখলেন আবু আবদুল্লাহ্। তাঁরা তাকে আবু আমর বলেও ডাকতেন। আবার কেউ কেউ আবদুল করিম নামেও তাঁকে ডাকত। পরে তিনি হযরত বিলাল (রাঃ) নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

ভাই খালিদ, বোন আকারা ও মা-বাবার সাথে হযরত বিলালের (রাঃ) বাল্যকাল ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। বিভিন্ন ইতিহাসজ্ঞদের কথায় জানা যায়, হযরত বিলালের (রাঃ) পিতামাতা দু'জনেই অতি নগণ্য ক্রীতদাস হলেও তাঁদের স্বভাবচরিত্র ছিল অতি নির্মল। তখনকার দিনের প্রচলিত বর্বরতা ও খারাপ কাজকে তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা এক সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রেখে মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতেন। তাঁদের চরিত্রে সততা ও সত্যবাদিতা ছিল। বাবা-মার গুণাবলী হযরত বিলালের (রাঃ) জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

হযরত বিলাল (রাঃ) তখন তরুণ। দীর্ঘ পাতলা দেহ, মসৃণ চামড়া, উজ্জ্বল তামাটে গায়ের রং, সুন্দর নাক, ঘন চুল, মিহি শ্মশ্রুশোভিত দুই গাল, দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট হযরত বিলালের (রাঃ) ছিল অক্লান্ত কর্মশক্তি। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, কিছুটা তোতলা হয়েও তিনি ছিলেন সুরেলা ও অত্যন্ত মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী। আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞানও ছিল তাঁর অসীম। নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল।

মক্কার শক্তিশালী জুমাহ্ গোত্রের উমাইয়া-বিন্-খালফ ছিল তাঁর মনিব। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক! সে হযরত বিলাল (রাঃ)কে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাতো, যদিও তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় সে খুশি ছিল এবং তার ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সে তাঁকে বিশ্বাস করত। দূরের যাত্রাপথের তাদের গোত্রের কাফেলা পরিচালনার দায়িত্ব তাই অধিকাংশ সময় তাঁকেই দেয়া হতো। ইয়ামেন বা সিরিয়া অভিমুখী ব্যবসায় উপলক্ষে যখন কাফেলা চলত, চলতে চলতে যাত্রীরা যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত, তখন অনেক সময়ই হযরত বিলাল (রাঃ) মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে তাদের ক্লান্তি দূর করতেন।

তাঁর মুখে মৃদু হাসি লেগেই থাকত। তিনি উপস্থিত হলেই সেস্থানের লোকেরা খুশি হ'য়ে উঠত।

## হযরত আবুবকরের (রাঃ) সাথে পরিচয় ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

একদিন ঘটনাচক্রে মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী হযরত আবুবকরের (রাঃ) (পরবর্তী সময়ে যিনি ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হয়েছিলেন) সাথে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা দু'জনই সিরিয়ার পথে যাচ্ছিলেন। পথে উভয়েই তাঁরা এক স্থানে বিশ্রামের জন্য থেমেছিলেন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) ছিল নিজের ব্যবসা। তখনো হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) ওপর ওহী নাযিল হয়নি।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যাত্রীদের হযরত বিলাল (রাঃ) যখন মধুর সুরে গান গেয়ে আনন্দ দান করছিলেন, মুগ্ধ হযরত আবুবকর (রাঃ) এগিয়ে এসে তাঁর সাথে আলাপ করেন।

আলাপ পরিচয়ে বিলালের কতকগুলো গুণে হযরত আবুবকর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই ভ্রমণের সময়ই হযরত বিলালের (রাঃ) মনে তাঁর পূর্বপুরুষদের ও নিজেদের তৈরি মাটি, কাঠ বা পাথরের মূর্তি পূজার বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হয় ও তাঁর মনে নানান রকম বিরূপ প্রশ্ন জাগে।

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি লক্ষ করলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) একজন দরবেশের কাছে গিয়ে তাঁর নিজের এক স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলে তার অর্থ বলে দিতে অনুরোধ করছেন।

দরবেশ বলছেন, আপনি ইনশায়াল্লাহ্ একজন ভবিষ্যৎ নবী, যিনি আপনার গোত্র থেকেই হবেন, তাঁরই প্রতিনিধি কর্মচারী হবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আপনিই হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফা।

বিলাল অবাক হয়ে গেলেন। দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ নবী! সে আবার কি?

দরবেশ বললেন, নবী হল আল্লাহ্‌র দূত। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে লোকদের সত্যের ও সুন্দরের পথে চালাবার নির্দেশ দেন।

মক্কার লোকেরা তখন মূর্তিপূজা করত। বিলালও তাদের মতো তাই করত। তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তিটার নাম ছিল হাবল। তাছাড়াও আল্ আল্লাত, আল্ উয্যা, ইসাফ, নায়িলাহ্ নামক মূর্তি ও আরও অনেক মূর্তিকে তারা পূজা করত। হাবল মূর্তিটার ডান হাতটা ভাঙা ছিল, কিন্তু পূজারীরা সেটা সোনা নিয়ে মেরামত করে দিয়েছিল।

বিলাল যখনই ব্যবসা উপলক্ষে যাত্রা করতেন, প্রথমে মূর্তিগুলোর,

বিশেষ করে হাবলের পায়ে পড়ে প্রণাম করতেন। ব্যবসায় লাভবান হ'য়ে ফিরে এসে ফের ঐ মূর্তিটার পায়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

এবার ব্যবসা থেকে ফিরে এসে হাবলের সামনে গেলেন। ভাবলেন, আচ্ছা হাবল যদি এতই ক্ষমতাশালী হয়, তবে নিজের হাতটা রক্ষা করতে পারল না কেন?

বেশ কিছুদিন হযরত বিলাল (রাঃ) মূর্তিগুলোর সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেন অনেক প্রশ্ন তাঁর মনকে বিক্ষিপ্ত করে। মূর্তিগুলোর অসারতা, এক আল্লাহ্ ও অনন্য চরিত্রের অধিকারী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) কথা ভাবেন।

এক রাত্রে হররত বিলাল (রাঃ) তাঁদের জনা নির্ধারিত ঘরে, মাদুরে শুয়ে এইসব কথা ভাবছিলেন। এসময়ে ফিসফিসে এক আওয়াজ শুনলেন,

ঃ বিলাল! বিলাল!

ঃ কী ব্যাপার হযরত আবুবকর? বিলাল উঠে আস্তে দরজা খুলে দিলেন।

ঃ শুনুন, খুবই একটা সুখবর এনেছি।

বিলাল এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, জনাব, সকাল পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যায় না?

ঃ না বিলাল, আমি আপনার মনিবের সামনে তা বলতে চাইনা এবং এই প্রাথমিক অবস্থায় তার কানে এসব যাওয়াও ঠিক নয়।

ঃ সেটা কী জনাব?

ঃ নবীর আবির্ভাব হয়েছে।

ঃ কে সে নবী?

ঃ আবদুল্লাহ্র পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আপনাদের কী বলেছেন?

ঃ বলেছেন, যে আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে তিনি ওহী পেয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দিতে ও অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিতে বলেছেন। হযরত বিলাল (রাঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, জনাব, যদি কিছু মনে না করেন, আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তিনি আর কী কী বলেছেন।

ঃ তিনি বলেছেন সবারই উচিত প্রাণহীন ওই মূর্তিগুলোকে পূজা না করে এই সুন্দর পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, সূর্য, মেঘ, সাগর, মরুভূমি, পৃথিবী ও তার বাইরের সব কিছুই যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই ইবাদত করতে।

তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার কাছে সব মানুষই সমান।

কেবলমাত্র সৎ ও ভাল কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেরও অন্যান্যদের কল্যাণ সাধন করতে পারে। তিনি গরিবদের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন।

তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আস্তে আস্তে তাঁর মনের পরিবর্তন হতে থাকে। এক আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মে এবং তা দৃঢ় হয়। তিনি হযরত আবুবকরের (সাঃ) সাথে উচ্চারণ করলেন, আশ্‌হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সেবক ও প্রেরিত পুরুষ।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, ইন্নশায়াল্লাহ্ আগামীকাল রাত্রে আমি আপনাকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে যাব।

হযরত আবুবকর (রাঃ) চলে গেলে, হযরত বিলাল (রাঃ) অনেকক্ষণ ধরে মহান সৃষ্টিকর্তার কুদরতের কথা ভাবলেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন এক নতুন জীবন পেয়েছেন।

নিজের দিকে তাকালেন। এই যে মনিবের জন্য রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছি, ভালভাবে ব্যবসা চালিয়ে তার শুধু লাভের পর লাভই করিয়ে দিচ্ছি, বদলায় আমি কী পাচ্ছি? উঠতে বসতে শুধু ছোটলোক বলে গালাগাল!

মনটা তাঁর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবু অনেক কারণে প্রাথমিকভাবে তিনি তার কাফের মনিবের কাজ বাধ্য হয়েই চালিয়ে যাবেন- ঠিক করলেন।

পরের দিনের ঘটনা। দিনের পর রাত নামল। আগের কথামত হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর বন্ধু হযরত আবুবকরের (রাঃ) বাড়িতে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি মেলে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) বাড়িতে হাজির হলেন। হযরত বিলালের (রাঃ) দৃষ্টি যখন মহানবীর (সাঃ) উজ্জ্বল মুখের প্রতি পড়ল আর তিনি কানে শুনলেন তাঁকে আহ্বান করা মধুর স্বর, প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তখন হযরত বিলালের (রাঃ) বুকে এক অভূতপূর্ব ভাব ও আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি মহানবীর (সাঃ) পাশে বসলেন। ক্রীতদাস বা নিচু ঘরের লোকের মতো নয়, একজন মর্যাদাসম্পন্ন সমান অধিকারী মানুষের মতো বসলেন। নবীর (সাঃ) হাতে হাত রেখে আবারও বললেন, আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সাথে কথা বলে তাঁর মন আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে গেল। এমন আনন্দ তিনি আগে কোনোদিনই পাননি।

## হযরত বিলালের (রাঃ) ধর্ম পরিবর্তনের পরিণাম

সকাল হবার আগেই হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর বিছানায় ফিরে আসেন এবং গভীর সুখ-নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েন। দিনে তিনি তাঁর মনিবের কাজ স্বাভাবিকভাবেই করে যান, কিন্তু রাতে সবাই যখন ঘুমাতে যায়, হযরত বিলাল (রাঃ) গোপনে বাসা থেকে বের হ'য়ে পড়েন। ছুটে আসেন নবীজির (সাঃ) কাছে। তাঁর মহা মূল্যবা ু বাণী শোনেন আর অল্প ক'জনের সাথে তাঁরা নামায আদায় করেন।

শীঘ্রই হযরত বিলালের (রাঃ) গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।

একদিনের ঘটনা। তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সামনে সারি সারি মূর্তি সাজানো। পূর্ব স্মৃতি তাঁর মনে ঝলক দিয়ে ওঠে। মন তাঁর লজ্জা, ঘৃণা ও অনুশোচনায় ভরে যায়।

তিনি সবচেয়ে বড় মূর্তি হাবলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে বললেন, এই যে নিষ্প্রাণ, দুর্বল দেবতা! তুমি না খুব শক্তিশালী! তবে কোথায় ছিলে তখন, যখন তোমার হাত ভেঙে গিয়েছিল? তুমি তা ঠেকাতে পারনি কেন? তোমার অত অহঙ্কার কোথায় ছিল, যখন তোমারই পূজারীরা তোমার ভাঙা হাত জোড়া দিয়ে দিচ্ছিল? আসলে তুই তো মাটি, কাদা আর পাথর ছাড়া আর কিছু না। তোকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললে, কিংবা তোর মুখে থুথু ছিটালেও তুই কিছুই করতে পারবি না! বলে হযরত বিলাল (রাঃ) মূর্তিটার মুখে থুথু ছিটালেন।

ঐ সময়ে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম প্রচার করার জন্য হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে ওহী আসে। ওহী পেয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য ডাক দেন। মূর্তিপূজা ছেড়ে দিতে বলেন।

এতে মক্কার প্রভাবশালী কোরাইশরা রেগে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তারা একত্রিত হ'য়ে নতুন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ায়। এমন কি তারা হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। এই কারণে

তারা একটি সভা ডেকে যখন এই সব আলোচনা করছিল, এমন সময় একজন লোক এসে উমাইয়ার কানে কানে কী যেন বলল। শুনেই উমাইয়া ক্রোধে ফেটে পড়ে।

ঃ কী! বিলাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে! একথা কি তুমি সত্যি সত্যিই বলছ?
ঃ অবশ্যই জনাব।
ঃ তুমি কি নিজে দেখেছ সে মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছে?
ঃ জ্বি, অনেকবার দেখেছি।
ঃ একথাটা তো আমি কোনোদিন ভাবিনি!
কিন্তু আমি এর চেয়েও খারাপ একটা দৃশ্য দেখেছি।
ঃ কী সে দৃশ্য?
ঃ আমি বিলালকে দেখলাম, সে আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত দেবতা হাবলের মুখে থুথু ছিটাচ্ছে।
ঃ কী! কী বললে তুমি! রাগে উমাইয়ার মাথায় যেন আগুনের হলকা ছুটোছুটি করছে। চেঁচিয়ে বলল, তার এতবড় সাহস হল! এ তো অমার্জনীয় এক অপরাধ!

সভায় অনেকের মধ্যে ছিল অন্য এক কোরাইশ নেতা আমর ইবনে হিশাম। তার ঔদ্ধত্যের কারণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে আবু জেহেল অর্থাৎ অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের পিতা নামে অভিহিত করেছিলেন। আবু জেহেল বলল, কেনা এই গোলামের আস্পর্ধার জন্য এমন কঠোর শাস্তি দিতে হবে, যা'তে পায়ের তলার দুর্বল অন্য কোনো কেনা গোলাম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সাহস না পায়। আর ওদিকে মুহম্মদটাকেও তার বিষ-ছড়ানো মতবাদ বন্ধ করাতে হবে। তার কারণে দুর্বল চরিত্রের লোকদের নষ্ট হতে দেয়া হবে না! না, কিছুতেই না!

উমাইয়া খুশি হল, ঠিকই বলেছেন, আপনি!

আবু জেহেল খুবই উত্তপ্ত। বলল, হ্যাঁ, ওই ধর্মত্যাগী বিলালকে কোনো রকম দয়া মায়া দেখানো উচিত না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মুহাম্মদের ওই নতুন ধর্মকে অচিরেই গলা টিপে মারবই মারব!

# নির্যাতিত হয়েও অদমিত হযরত বিলাল (রাঃ)

খুব রেগে, অতি বেগে উমাইয়া হযরত বিলালের (রাঃ) কামরায় এল। এসে শোনে বিলাল যেন কী আবৃত্তি করছে। এর আগে সে এমন আবৃত্তি শোনেনি।

অ! সে বিড়বিড় করে বলল, এ নিশ্চয়ই মুহাম্মদের ক্বোরানের সেই যাদু যা আমার কেনা গোলামটাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে!

উমাইয়া চিৎকার করে ওঠে, বিলাল! তুই কী পড়ছিস?

হযরত বিলাল (রাঃ) ধীরে উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র কালাম।

ঃ আল্লাহ্‌র কালাম- মানে পাগলের প্রলাপ তো?

ঃ জ্বি না, আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র ক্বোরান নাযিল করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের জ্ঞান দিয়েছেন- এসব সেই জ্ঞানের কথা।

উমাইয়া খেঁকিয়ে উঠল। বাস্, বাস্ যথেষ্ট হয়েছে! আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

হযরত বিলাল (রাঃ) তখনো বলে চলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

ঃ ওরে অধঃপতিত গোলাম! তোর সাহসের সীমা দেখছি অনেক বেশি ছাড়িয়ে গেছে! তুই আমাদের দেবতাদের অস্বীকার করে এক যাদুকরের অনুসরণ করে ভুল পথে চলেছিস্!

ঃ না, আমি ভুল পথে চলছি না। আল্লাহ্ আমাকে সঠিক সরল পথেই পরিচালনা করছেন।

আর সহ্য করতে পারেনা উমাইয়া। ঠাস করে হযরত বিলালের (রাঃ) গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। গলাফাটা চিৎকার করে গালিগালাজ করে।

ঃ বেয়াদব! বেয়াড়া কোথাকার! তুই হলিগ্যে আমার পায়ের তলার চাকর- কেনা গোলাম! আল্লাহ্ নয়, আমি তোকে যেভাবে চালাব, তুই সেই ভাবে চলবি! যা করতে বলব, তাই করবি! আমি যা বিশ্বাস করি, যে দেবতাদের মানি, তোকেও তা বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে!

হযরত বিলাল (রাঃ) নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দেয়, নিশ্চয়ই আপনি আমার মনিব, আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছেন। কিন্তু আপনি আমার দেহটাকেই শুধু কিনেছেন, মনটা আমার সম্পূর্ণ নিজের। সে মন এখন আল্লাহ্ ছাড়া আর

কাউকে বিশ্বাস করে না, মানে না!
ঃ চুপ বেয়াদব! তোকে দেখছি মুহাম্মদ একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে!
ঃ জ্বি না হুজুর, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে নষ্ট করেননি, বরঞ্চ তিনি আমাকে ঠিক মতো চলার পথ দেখিয়েছেন।

উমাইয়া তার কেনা গোলামের সাহস দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। দারুণ তেজে সে ফেটে পড়ে।

ঃ ওরে কালো মেয়েলোকের কুচকুচে কালো ছোকরা! আমি আমার দেবতাদের নামে কসম কাটছি, তুই তোর এই ধর্ম না ছাড়া পর্যন্ত তোকে আমি যত রকম কঠোর শাস্তি আছে তাই দেব! তোর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা, আর ইসলাম ধর্ম মেনে চলার মজাটা আমি তোকে দেখাব!

হযরত বিলালের (রাঃ) মুখ থেকে আপনিই বের হয়ে যায়, আমার জান বেরিয়ে গেলেও আমি ইসলাম ধর্ম ছাড়ব না। এই ইসলাম হল মানুষের মুক্তির ধর্ম।

সাথে সাথেই হযরত বিলালের (রাঃ) ওপর শুরু হয় নির্যাতন! সপাং সপাং চাবুকের ঘা! কিন্তু তবুও তাঁর মুখ থেকে শুধু একই স্বর উচ্চারিত হ'তে থাকে, আহাদ! আহাদ! আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

উমাইয়ার আদেশে হযরত বিলালের (রাঃ) হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা হল। গলাতেও পেঁচানো হল শক্ত একটা মোটা দড়ি। তাঁকে খালি গা করা হল। খুব তাগড়া ক'জন জোয়ান তাঁকে চাবুকের পর চাবুক মেরে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে থাকে। উঃ। সেকী, ভীষণ নিষ্ঠুর নির্যাতন! হযরত বিলালের গা বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। এক সময়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

যখন জ্ঞান হল, বুঝলেন তাকে একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁর আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাকে রাতদিন এখানেই কাটাতে হবে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভাই ও বোনের মুখ। আহা! একবার যদি ওদের কাছে যেতে পারতাম! একবার যদি ওদের দেখতে পেতাম! মহানবীর (সাঃ) মুখটাও চোখের সামনে ভাসে। বাঁচার প্রেরণা পান, উঠে বসতে চাইলেন। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা!

আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে হযরত বিলাল (রাঃ) এই মুহূর্তে একজন অতি খাঁটি মুসলমানে বদলে গেলেন। তাঁর শরীরের সব জ্বালা যন্ত্রণার শেষ হল। মন তাঁর আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে এখন ভয় করেন না। আল্লাহ্‌ যদি তাঁকে দয়া করেন, তিনি বাঁচবেন, মুক্তি পাবেন, তাঁর এবাদত করার সুযোগ হবে; আর তা না হলে তাঁরই নাম যপতে যপতে মৃত্যুবরণ করবেন।

পরদিন সকালে উমাইয়া ও তার লোকজন উঁকি দিয়ে দেখে বিলাল মরে গেছে না বেঁচে আছে!

দেখল, না, বেঁচে আছে। ওরা দরজা খুলে দিল।

উমাইয়া ভাবল, তার কেনা গোলামটা তারে পা জড়িয়ে ধরে মাফ চাইবে। কিন্তু তার বদলে একী! তাঁর মুখ থেকে সেই একই কথা বের হচ্ছে! আল্লাহ্‌ এক, আল্লাহ্‌ এক। উঃ! অসহ্য! উমাইয়া তার লোকদের আদেশ দিল, এই বেয়াদবটাকে মক্কার পাথুরে পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যা! এই উদ্ধত ও বিদ্রোহী গোলামের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

উমাইয়ার লোকেরা অতি উল্লাসে হযরত বিলাল (রাঃ)কে শাস্তি দেবার কাজে নামে। তারা হৈচৈ করতে করতে তাঁকে কাঁকরভরা পথের ওপর, দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিতে শুরু করে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠেন হযরত বিলাল (রাঃ)।

এমনি অত্যাচার চলল অনেক দিন ধরে। ব্যথায়- যন্ত্রণায় শরীর নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে হযরত বিলালের (রাঃ), কিন্তু তবুও তাঁর মুখে সেই একই রব! আল্লাহ্‌ এক, আল্লাহ্‌ এক!

এসময় আবু জেহেল এগিয়ে আসে। আরো অসহনীয় ভীষণ কঠোর এক শাস্তির পরামর্শ দেয়।

সূর্য তখন মাথার ওপরে উঠেছে। প্রখর রৌদ্র পৃথিবীতে গনগনে আগুন ঝরাচ্ছে। আগুনের সে তাপে মরুভূমি ভীষণ উত্তপ্ত। হযরত বিলালকে (রাঃ) টেনে হিঁচড়ে সেই উত্তপ্ত বালুতে চিৎ করে শোয়ানো হল। হায়রে! কী নিষ্ঠুর উমাইয়া ও তার লোকেরা! গরম বালুতে চিৎ করে শুইয়েই শুধু ক্ষান্ত হল না, তাঁরা হযরত বিলালের (রাঃ) বুকের ওপর খুব বড় ও ভারি একখানা পাথর চাপা দেয়। বলে, তুই যে পর্যন্ত না তোর আল্লাহ্‌ ও মুহাম্মদকে ছেড়ে আমাদের দেবতা হাব্‌ল, লাত, উয্‌যা এদের নাম করবি, তোকে এরকম অবস্থাতেই রাখা হবে।

উঃ! প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো অসহ্য পরিস্থিতি! যন্ত্রণা সহ্য করার আর ক্ষমতা নেই! তবুও মুখে আল্লাহ্‌র নাম। এক সময়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর মনে হল তিনি যেন একটা সবুজ মাঠে, সুন্দর ফুল ও ফলের বাগানে, গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। তাঁর চারপাশে বিভিন্ন দেশের, নানান ধরনের স্ত্রী-পুরুষ আনন্দের সাথে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পিপাসায় হযরত বিলালের (রাঃ) গলা শুকিয়ে উঠছিল। তাঁরা তাঁকে একটা সুশীতল পানির ঝরনার কাছে নিয়ে গেলেন। পরম তৃপ্তির সাথে বিলাল (রাঃ) পানি পান করলেন। তাঁর মনে হ'ল তিনি আল্লাহ্‌র অতি কাছে এসে পৌঁছেছেন।

এরপর কিছুটা জ্ঞান ফিরে এল বেলালের। কিন্তু একটুও নড়তে পারছেন না। মরার মতো তিনি পড়ে আছেন। এ সময়ে শুনলেন দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। একজন তার নির্দয় মনিব, অন্যজন হযরত আবুবকর (রাঃ)। আবুবকরের স্বর মায়া জড়ানো। তিনি বলছেন, উমাইয়া, তুমি এই লোকটিকে আর কত যন্ত্রণা দেবে? এর প্রতি তুমি একটু সদয় হও! ওকে না হয় তুমি অর্থের বদলে বিক্রি করে দাও।

ঃ না, তা হয় না। বলল উমাইয়া। অবাধ্য গোলামকে বশে না এনে শুধু টাকা পয়সার জন্য আমি তাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

তবু হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন,না হয় আমার কাছেই ওকে বিক্রি কর।

উমাইয়া ইচ্ছে করে এমন একটা প্রস্তাব রাখল, ভাবল আবুবকর (রাঃ) তার কথা রাখতেও পারবেনা, আর বিলালকেও মুক্ত করতে পারবে না। বলল, আপনি যদি এই কালো কাফ্রীটার বদলে আপনার রূপবান ক্রীতদাস ফুসতাস্ রুমীকে ও সে সাথে আরো একশত দিরহাম দেন, তবেই আমি একে আপনার কাছে ছেড়ে দেব। হযরত আবুবকর (রাঃ) সাথে সাথেই উমাইয়ার দাবিমত টাকা ও ক্রীতদাস রুমীকে দিয়ে হযরত বিলালকে (রাঃ) নিতে রাজি হলেন।

সেখানে তখন কোরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ান উপস্থিত ছিল। সে বলল, মক্কার প্রথা ও রীতি অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত অবস্থায় কেনো ক্রীতদাসকে বিক্রি করা যায় না।

প্রতুত্তরে উমাইয়া বলল, আপনার কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু

এ ক্রীতদাস তো এখন মৃত। মৃত বলেই এটার দাম মাত্র একশ' দিরহাম ধরেছি।

এসময়ে বহুকষ্টে বিলাল (রাঃ) একবার চোখ খুললেন। উমাইয়া ছুটে তাঁর কাছে গেল। গিয়ে বলল, এ্যাই কালো কাফ্রী! কালো জানোয়ার! একটু শ্বাস টেনে নেনা!

উমাইয়া যখন দেখল হযরত বিলাল (রাঃ) সত্যি সত্যিই বেঁচে আছেন, তখন তার উল্লাস দেখে কে !

ঃ আরে এ যে দেখছি সত্যি সত্যিই বেঁচে আছে!

তখনই সে হযরত আবুবকরের কাছে দাবি করল, এখন আমি একে দুশো দিরহামের কমে বিক্রি করব না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) উমাইয়ার দাবি করা টাকা ও তাঁর রূপবান ক্রীতদাস পৌত্তলিক রুমীকে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, উমাইয়া, তুমি বিলালের মর্যাদা বুঝতে পারছ না। আমি তাঁকে ইয়েমেন রাজ্যের চাইতেও বেশি মূল্যবান মনে করি।

# হযরত বিলালের (রাঃ) দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ

হযরত বিলালের (রাঃ) বুক থেকে ভারি পাথর সরিয়ে নেয়া হ'ল। তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হল। অতি কষ্টে তিনি চোখ খুললেন। দেখলেন হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) পালিত পুত্র জায়েদ তাকে ধরে আছেন। জায়েদ মমতামাখা স্বরে বললেন, হযরত বিলাল, আপনার দাসত্বের শৃঙ্খল খুলে দেয়া হল! আজ থেকে আপনি মুক্ত। জায়েদের সাহায্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত বিলালকে ধরে ধরে তাঁর নিজের বাসায় নিয়ে এলেন। হযরত বিলালকে এত অমানুষিকভাবে মারা হয়েছিল যে আরও পাঁচ দিন জীবন-মৃত্যুর সাথে তাঁর লড়াই চলে। তাঁকে যে কত রকম ওযুধ খাওয়ানো হয়েছিল, আর কত রকম মলম যে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহে প্রলেপ দেয়া হয়েছিল, হযরত বিলাল (রাঃ) তা জানতেও পারেননি।

একদিনের ঘটনা তিনি খুব আবছাভাবে মনে করতে পারেন। কে যেন তার শিয়রে বসে দোয়া দরূদ পড়ছেন। কিন্তু আর কিছু মনে নেই। এরপরেই তিনি জ্ঞানহারা হ'য়ে গিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ দিনে তিনি ঘর থেকে বাইরে গিয়ে বসতে পেরেছিলেন। দেখে হযরত আবুবকরের (রাঃ) আনন্দের আর সীমা ছিল না। তিনি নিজ হাতে ছাগির দুধ দোহন করে হযরত বিলালকে খাওয়ালেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, জান বিলাল, জীবনে আমি তোমার মতো ভাগ্যবান লোক আর দেখিনি। মহানবী (সাঃ) তিন দিন ধরে তোমার বিছানার পাশে বসে তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে দোয়া করেছেন। তোমার জ্বর কমলে ও বিপদ কেটে গেলে তারপর তিনি চলে গেছেন

সুস্থ হবার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত বিলালকে মহানবীর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন। নবী (সাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শুরু হল হযরত বিলালের (রাঃ) নতুন আনন্দ-ভরা দিন। তিনি সারাক্ষণ নবীজির (সাঃ) পাশে পাশে আছেন। নিজেকে ধন্য মনে করছেন। মহানবীর (সাঃ) অধীনে তিনি চাকর নয়, রাজার মর্যাদায় দিন কাটাতে থাকেন।

# আযানের গুরুত্ব ও ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন

হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন। এ বিষয়ে কিছু বলবার আগে আয়ানের গুরুত্ব সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলে নিই, ক্যামন? তোমরা তো রোজই দিনে ও রাত্রে পাঁচবার মসজিদ থেকে আযানের সুর ভেসে আসতে শোন, তাইনা? এই আযানের অর্থ কি জান? এর অর্থ হল আহ্বান বা ডাকা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের জন্য মুসলমানদের মসজিদে ডাকাকেই আযান বলা হয়। জেনে রেখো, ইসলামের এবাদতগুলোর মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আরবিতে নামাযকে বলা হয় সালাত। এই সালাতের জন্য যে আহ্বান, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ বক্তব্যের মাধ্যমে মুমিনদিগকে নামাযের জন্য ডাকা হয়। কীভাবে এই আহ্বান করা হবে, তার পেছনেও কিছু ঘটনা আছে। মুসলমানেরা যখন মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনায় এলেন, তখন জামায়াতে নামায পড়ার প্রচলন হয়নি। একত্রে পড়ার জন্য কিভাবে নামাযিদের ডাকা যায় তা নিয়ে মুসল্লিরা আলোচনা করেন। একজন বললেন, খ্রিষ্টানরা যেরকম ঘন্টা বাজিয়ে তাঁদের অনুসারীদের গির্জায় ডাকেন, সেরকমভাবে ডাকা হোক! অন্য একজন বললেন, ইহুদিদের ঘন্টাধ্বনির মতো বিউগল বাজিয়ে ডাকলে ভাল হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি পরামর্শ দেই, একজন কেউ কোন উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে, লোকদের নামাযের জন্য ডাকুক!

নবীজি (সাঃ) সাথে সাথেই বললেন, তাহলে বিলাল, তুমিই নামাযের জন্য মুসুল্লিদের ডাকার দায়িত্ব নাও!

নবী (সাঃ) হযরত বিলালকে (রাঃ) কিভাবে আযান দিতে হবে শিখিয়ে দেন। হযরত বিলাল (রাঃ) কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে নামাযের জন্য প্রথম আযান দিলেন। সে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তিনি হলেন মুসলিম জাহানের প্রথম মুয়াযযিন। নবী (সাঃ) তাঁকে মসজিদে নববীর স্থায়ী মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি মক্কার মসজিদুল হারামে আযান দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং পরে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত মহানবীর (সাঃ) নির্দেশেই তিনি জেরুজালেমে হযরত সুলায়মান (আঃ) নির্মিত বায়তুল আকসা মসজিদে আযান দেন।

মহানবী (সাঃ) তাঁকে দেশে ও সফরেও আযান দেয়ার ভার দেন।

নামাযে ডাকার জন্য পদ্ধতির দিক দিয়ে আযানের সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয়না।

আযানের প্রতিটি শব্দের বিশেষ অর্থ রয়েছে এবং আযান মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আযানের শব্দগুলোর মধ্যে ইসলামের মূল শিক্ষার কথা রয়েছে।

আমি একটু বিশদভাবে তোমাদের তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মাত্র শেষ বাক্যটি ছাড়া আযানের বাকি সব বাক্য দু'বার করে উচ্চারণ করা হয়। সর্বপ্রথম 'আল্লাহু আকবর' চার বার বলা হয়।

আল্লাহু আকবর, অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ মানবজাতিসহ বিশ্বজগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি পৃথিবীর সব কিছু পালন করছেন। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর আদেশ, নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর বা পৃথিবীর বাইরে কোন কিছুই ঘটেনা। কাজেই তিনি যে অদ্বিতীয়, মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আযানের পরবর্তী বাক্যটি হ'ল, আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এর অর্থ হল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। লক্ষ কর, এই বাক্য দ্বারা ইসলামের মূল বক্তব্য আল্লাহ্‌র একত্ববাদের যাকে বলা হয় তৌহিদ, তার ঘোষণা রয়েছে।

আযানের তৃতীয় অর্থবহ বাক্য হল, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ আমি সাক্ষৎ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর জীবনবিধান ঠিক ঠিক মতো চালাবার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ও শান্তির সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক পথ প্রদর্শক। কাজেই তাঁকে অনুসরণ করলে জীবনে শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্য, লাভ করা যাবে।

এর পরের বাক্যটি হল, হাইয়ালাস্ সালাহ্ অর্থাৎ নামাযের জন্য এস! যেহেতু নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, নামায মানুষকে সকল রকম ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ও খারাপ কাজ করতে বাধা দেয়, সেজন্য নামাযের প্রতি এই ডাক।

এরপর বলা হয়, হাইয়ালাল্ ফালাহ্ ,অর্থাৎ কল্যাণের দিকে এস! নামাযের মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। দেহের পবিত্রতা, মনের শান্তি এবং ইহজগৎ ও পরজগতের সাফল্য এই নামাযের মধ্য দিয়ে মানুষ পেয়ে থাকে। তাই নামাযকে সরাসরি ফালাহ্ বা কল্যাণরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

সবশেষে আবারও দু'বার আল্লাহু আকবার এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে আযান শেষ করা হয়।

ফজরের সময় যখন বেশিরভাগ লোকই ঘুমিয়ে থাকে বা ঘুম ভাঙলেও বিছানায় শুয়ে থাকে, তখন হাইয়ালাল্ ফালাহ্বর পর আসসালাতু খাইরুম্ মিনান্নাউম্ অর্থাৎ নিদ্রার চেয়ে নামায উত্তম, এই বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ করতে হয়।

আযান মানুষের কোন মনগড়া বিষয় নয়।স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় মহানবী (সাঃ) তা আরম্ভ ও প্রচার করেন।

এই যে এত গুরুত্বপূর্ণ আযান, তা সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে মুসল্লিদের নামাযের জন্য ডাকার প্রথম দায়িত্ব নবীজি (সাঃ) দিয়েছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ) কে।

মদীনা শরীফে আযান প্রথম যে দিন যেভাবে চালু হয়, মুসলিম বিশ্বের সব জায়গায় আজ পর্যন্ত তা সেভাবেই চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইনশায়াল্লাহ্ সেইভাবেই চালু থাকবে। হযরত বিলালের (রাঃ) উচ্চকণ্ঠের আযানের সুরে এমন একটা মোহময় প্রভাব ছিল যে, তা মানুষের মনকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। তাঁর আযান শোনা মাত্রই মুসুল্লিরা তাঁদের যাবতীয় কাজ ফেলে মসজিদে ছুটে যেতেন।

# মদীনায় হযরত বিলাল (রাঃ)

ইসলাম ধর্ম-দীক্ষা গ্রহণকারীদের প্রথম সাত থেকে নয় জনের মধ্যে হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন একজন। এই ধর্ম গ্রহণের জন্য তাঁকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। কিন্তু অসহ্য নির্যাতনের মধ্যেও আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

মক্কার মুসলমানদের ওপর যখন কাফেরদের নৃশংস অত্যাচার চলছিল, তখন মদীনার বেশ কয়েকজন অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহানবী (সাঃ) মক্কার অধিবাসীদের আদেশ দিলেন, যারা তোমরা মূর্তিপূজকদের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছ না, তোমাদের তাহলে মদীনায় চলে যাওয়াই উচিত।

তিনি প্রথমে আবু সালামা আব্দুলাহ্ বিন্ আশ্‌হালকে এবং তার পরেই হযরত বিলালকে (রাঃ) মদীনায় যেতে বললেন। নবীজিকে (সাঃ) মক্কায় রেখে হযরত বিলালের (রাঃ) মদীনায় যেতে কিছুতেই মন চাচ্ছিল না। কিন্তু নবীর (সাঃ) নির্দেশ। সঙ্গি-সাথিদের নিয়ে তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করেন।

তাঁরা মদীনায় প্রবেশ করলে সেখানকার আনসাররা অর্থাৎ সাহায্যকারী মুসলমানেরা তাঁদের খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করেন।

নিজেদের বাড়িতে তাঁদের সাথে থাকবার ব্যবস্থা করেন। হযরত বিলাল (রাঃ) সাদী ইবনে খাইসামার গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু নবীজিকে (সাঃ) ছেড়ে এসে হযরত বিলালের (রাঃ) একটুও ভাল লাগছিল না।

নবী (সাঃ) কবে মদীনায় আসবেন, এই প্রতীক্ষায় তিনি পথ চেয়ে থাকতেন। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় তাঁর দীর্ঘদিন কেটে যায়। অবশেষে একদিন মহানবী (সাঃ) হযরত আবুবকরকে সাথে নিয়ে বেশ কষ্ট করে মক্কা থেকে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) মদীনাবাসীদের সাথে তাঁকে এগিয়ে আনতে ছুটে গেলেন। নবীজিতে (সাঃ) জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথায় চুমু খেলেন। পরে হযরত আবুবকরকেও (রাঃ) তাই করলেন।

প্রথমে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত বিলালের (রাঃ) মদীনার আবহাওয়া সহ্য হয়নি। দু'জনেই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে হযরত বিলাল (রাঃ) মক্কার কথা বার বার বলতেন। প্রিয় সাহাবীর মানসিক দুঃখের কথা শুনে নবীজি (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার কাছে হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি এই ইয়াসরব নগরীকে আমাদের কাছে মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে তোল! হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্যরা অসুখ থেকে সেরে উঠলেন।

মক্কার অভিবাসীরা (মুহাজিররা) কালক্রমে মদীনার জলবায়ু ও আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর মদীনাবাসীদের আন্তরিকতায় তাঁদের মন ভরে ওঠে।

মহানবী (সাঃ) মদীনায় ইসলাম ধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। শহরে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই তিনি করতে শুরু করেন। তিনি মদীনার ইহুদীদের সাথে একটা চুক্তি করেন যা'তে ইহুদী ও মুসলমানেরা উভয়ে উভয়ের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। এই সব কাজ করার সময় তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)

# মহানবীর (সাঃ) ঘনিষ্ঠ সাথিরূপে হযরত বিলাল (রাঃ)

সব রকম কাজেই হযরত বিলাল (রাঃ) নবীজির (সাঃ) পাশে পাশে থাকতেন। মহানবী (সাঃ) মদীনায় বিখ্যাত মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং এটিকে ইসলাম ধর্মের কার্যাবলীর একটি প্রকৃষ্ট কেন্দ্রস্থলরূপে গড়ে তোলেন। এখানে নবীজির সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হ'ল হযরত বিলালের (রাঃ)

অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে নেন। হযরত বিলালের (রাঃ) এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হওয়ার চেয়ে মহানবীর (সাঃ) খেদমত ও কাজ করা অনেক বেশি পছন্দ করলেন। তাঁর সাথেই থেকে গেলেন। তিনি নবীজির (সাঃ) যাবতীয় কাজ খুবই খুশি হয়ে করতেন। তিনি একাধারে তাঁর ব্যক্তিগত খাদেম, গোমস্তা, তাঁর ও তাঁর পরিবারের খাবার দাবারের ব্যবস্থা এবং মেহমান ও মুসাফিরদের যাবতীয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নবী (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারের সবাই তাঁকে পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করতেন। রাসূল কন্যা বিবি ফাতিমার (রাঃ) বিয়ের যাবতীয় আয়োজন ও কাজকর্মের পূর্ণ দায়িত্ব লাভের সৌভাগ্য একমাত্র হযরত বিলালেরই (রাঃ) হয়েছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা কিছু রোজগার করতেন, সেসব টাকা-পয়সার দায়িত্বও তিনি হযরত বিলালের (রাঃ) ওপর দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে তিনি কোষাধ্যক্ষ (খাজিন) নিযুক্ত করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে নবীর একজন সাহাবী যাবিরের একটি ঘটনার বিবরণ। একদিন যাবির তাঁর নিজের উটের পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। খুবই ক্লান্ত হ'য়ে উটটি অতি ধীরে ধীরে চলছিল। ঘটনাচক্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উটটিকে মৃদুভাবে ছুঁ'য়ে দিলেন। আশ্চর্য! সাথে সাথেই উটটি সতেজ হ'য়ে চলতে শুরু করে। মুহাম্মদ (সাঃ) যাবিরের কাছ থেকে উটটি কিনতে চাইলেন। স্বভাবতই যাবির খুব খুশি হলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁর উটটি কিনবেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হ'তে পারে? মদীনায় আসার পর যাবির যখন উটটি রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন, তিনি তাঁর অনেক উচ্চপদের কর্মচারীদের বাদ দিয়ে হযরত বিলালকেই (রাঃ) বললেন, বিলাল, উটটি নিয়ে তার দাম দিয়ে দাও!

হযরত বিলালকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধু মুয়াযযিনই নিযুক্ত করেছিলেন তা নয়। কোনো কিছু জনসাধারণকে জানাতে হ'লে তাঁকে দিয়েই ঘোষণা দেয়াতেন।

একদিনের ঘটনা। (হাদীস) একদিন এক মরুবাসী আরব এসে রাসূলে করিমকে (সাঃ) বললেন যে, তিনি রমযান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছেন। রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি খাঁটি মুসলমান, তখন তিনি হযরত বিলালকে (রাঃ) ডেকে বললেন, বিলাল, তুমিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঘোষক। তুমি এখনই ঘোষণা করে দাও যে, আগামীকাল থেকে সবাইকে রোজা রাখতে হবে।

অপর একজন সাহাবী আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে লুণ্ঠিত দ্রব্য বা গণিমতের মাল পেতেন কিংবা সাহাবীদের কাছ থেকে দ্রব্য সামগ্রী উপহার পেতেন, তিনি হযরত বিলালকেই (রাঃ) জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করতে বলতেন যেন অন্যান্য লোকেরাও যুদ্ধে পরাজিত লোকদের কাছ থেকে যা পেয়েছে, তা নিয়ে যেন তাঁর কাছে চলে আসে।

নবীজির (সাঃ) সব রকম যুদ্ধ অভিযানেও তিনি একজন প্রধান ও সক্রিয় সহচররূপে তাঁর পাশে থাকতেন। যুদ্ধে তিনি নবীর (সাঃ) দেহরক্ষীদের একজন ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তিনি মহানবীর (সাঃ) সেনাবাহিনীর সহকারী কর্মচারী হিসেবেও কাজ করতেন।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে বদরের যুদ্ধে নবীজি (সাঃ) নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) সারাক্ষণ তাঁর যুদ্ধের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

পরের বছর ওহোদের যুদ্ধে তিনি নবীর (সাঃ) যুদ্ধ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নির্দেশাবলী সাহাবীদের কাছে পৌঁছে দেবার ও যুদ্ধক্ষেত্রে এক এলাকার খবরাখবর অন্য এলাকায় জানিয়ে দেবার মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তার পরের বছর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের খন্দকের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ছিল এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটময় অবস্থা।

নবী (সাঃ) শত্রুদের হামলার আত্মরক্ষার জন্য আগেই মদীনার চারপাশে সুগভীর ও চওড়া খন্দক অর্থাৎ পরিখা খনন করা শুরু করেন। নবীজি (সাঃ) অন্যান্যদের সাথে নিজেও কোদাল হাতে কাজে নামেন। এ সময়ে বিলাল (রাঃ) একটানাভাবে অনেকক্ষণ ধরে মাটি কুপিয়ে পরিখা তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে নেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তাঁর গা থেকে দরদর করে এতই ঘাম ঝরত যে মনে হতো তিনি সদ্য গোসল করে এসেছেন।

## উমাইয়ার সাথে হযরত বিলালের (রাঃ) আকস্মিক সাক্ষাৎ

হযরত বিলাল (রাঃ) মাঝে মাঝেই তাঁর বর্তমান সৌভাগ্যের কথা ভাবতেন, আর আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মনটা ভরে উঠত। মহানবীর (সাঃ) অপার করুণা, স্নেহ ও মায়া-মমতার কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে অতীতের সেই অসহ্য, নিষ্ঠুর নির্যাতনের দৃশ্যগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। উঃ! কী ভয়ানক নিষ্ঠুর ছিল তার মনিব দানবরূপী ওই উমাইয়াটা! উমাইয়ার পাশে নবীজির (সাঃ) কোমল ও আন্তরিক ব্যবহারের কথা মনে করে কৃতজ্ঞতা ও সুখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ত।

বদরের যুদ্ধে ঘটনাচক্রে হযরত বিলালের সাথে উমাইয়ার দেখা হ'য়ে যায়। উমাইয়াকে তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন্ আউফ, যিনি প্রথম দিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, বন্দি করে নবীজির (সাঃ) কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়ার পুত্র আলীকেও তিনি বন্দি করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে আব্দুর রহমানের সাথে উমাইয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। স্বভাবতই তাঁর মনে উমাইয়ার জন্য একটা নরম স্থান ছিল।

আব্দুর রহমান উমাইয়া ও তার পুত্রকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন, দূর থেকে তা হযরত বিলালের নজরে পড়ল। তিনি ছুটে কাছে এলেন। উমাইয়াকে দেখে হযরত বিলালে (রাঃ) রক্ত মাথায় উঠে এল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। নিষ্ঠুর অত্যাচারের অসহনীয় দৃশ্যগুলো তাঁর মনে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে! সেই তাঁকে মারতে মারতে আধমরা করে অন্ধকার কুঠুরিতে ফেলে রাখা, আল্লাহর পবিত্র নাম উচ্চারণের কারণে তার মুখে লাথি মারা, চাবুকের ঘায়ে তাকে রক্তাক্ত করা, তাকে গলায় দড়ি বেঁধে পাথুরে এবড়ো থেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া, গনগনে উত্তপ্ত বালুর ওপর তাকে চিৎ করে শুইয়ে বুকে শক্ত পাথর চাপা দেয়া সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উঃ! কী ভীষণ সে শারীরিক যন্ত্রণা! হযরত বিলাল (রাঃ) যেন এই মুহূর্তে সেই ব্যথা-যন্ত্রণায় জর্জরিত হচ্ছেন। তাঁর কানে বাজছে উমাইয়ার তীব্র ঘৃণার সাথে উচ্চরিত আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) প্রতি অকথ্য গালিগালাজ ও অপমানকর কথা!

তিনি চিৎকার করে উমাইয়ার দিকে ছুটে যান।

ঃ রে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফের উমাইয়া! তোকে আজ আমি হাতে পেয়েছি। কিছুতেই আমি তোকে ছেড়ে দেব না। হয় তুই বাঁচবি, নয় আমি বাঁচব। আবদুর রহমান হযরত বিলাল (রাঃ) কে বাধা দিলেন।

ঃ জনাব এ আমার বন্দি। আমার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে। তাকে আমার রক্ষা করা উচিত।

কিন্ত হযরত বিলালেঃ কানে সেসব কোন কথাই ঢোকেনা। তিনি সেখানকার লোকদের চিৎকার করে ডাকছেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী কারা আছেন, আসুন! এগিয়ে আসুন! আল্লাহ্ রাসূলের বিরোধী, জঘন্যতম একটা শত্রু, একটা শয়তান কাফেরকে হাতের নাগালে পেয়েছি। আসুন! আপনারা সবাই এসে এর বিচার করুন। সমুচিত শাস্তি দিন।

আর যায় কোথায়? ছুটে এল মুসলিম জনতা। অ! এই সেই ইবলিশ উমাইয়া বিন্ খাল্‌ফ্? এই সেই মানুষরূপী পশু! এই পশুকে আর ছেড়ে দেয়া যাবে না।

ওরা সবাই উমাইয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আব্দুর রহমান ক্ষিপ্ত জনতাকে থামাতে চেষ্টা করেন।

ঃ বন্ধুগণ! আমি জানি এই কাফের হযরত বিলালের (রাঃ) মতো একজন পুণ্যবান লোককে জঘন্যতম অত্যাচারে জর্জরিত করে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আমি নিশ্চয়ই বিচার করে ওর শাস্তির ব্যবস্থা করব! কিন্তু এখন ও আমার বন্দি। ও আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দোহাই তোমাদের ওকে তোমরা মের না!

কিন্তু কে শোনে কার কথা? হযরত বিলালের (রাঃ) প্রতি এই উমাইয়ার পরম নির্দয় ব্যবহারের কথা তারা শুনেছে, অনেকেই নিজের চোখে তা দেখেছে। না, তারা তাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না।

আব্দুর রহমানের কাছ থেকে জোর করে তারা উমাইয়া ও তার পুত্রকে ছিনিয়ে নিল। নিয়েই ভীষণ রাগে গজরাতে গজরাতে তারা উমাইয়ার দেহটাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলল। আলীকেও তারা রেহাই দিলনা।

হযরত আবুবকরের কানে এ খবর গেলে তিনি বলে উঠলেন, শাবাশ হযরত বিলাল! আল্লাহ্‌তায়ালা এর উপযুক্ত বিচারই করেছেন।

## মহানবীর (সাঃ) প্রিয় সহচর হযরত বিলালের (রাঃ) মর্যাদা

৬২৯খ্রিষ্টাব্দ। নবী করিম (সাঃ) মক্কা বিজয় করে দশ সহস্র সৈন্য ও সাহাবীসহ মক্কায় প্রবেশ করেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী কাফেরদের দমন করা হয়েছে। এবার তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। ৩৬০টি দেব দেবীর মূর্তি ভেঙে চূর্ণ করে ফেললেন এবং নবীর নির্দেশে সেই বিচূর্ণ স্তুপ রাশির ওপর দাঁড়িয়ে হযরত বিলাল (রাঃ) উচ্চৈস্বরে কালেমা শাহাদত ঘোষণা করলেন।

কাবা ঘরের দেয়াল ও মেঝে পরিষ্কার করা হ'ল। নবীজি (সাঃ) হযরত বিলালকে (রাঃ) কাবা ঘরের ছাদে উঠে আযান দিতে বললেন।

অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে হযরত বিলাল (রাঃ) মুসল্লিদের নামাযের জন্য আহ্বান করেন। তাঁর কাঁপা কাঁপা, মোহময়, সুমধুর আযানের স্বর উপত্যকার অনেকটা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মক্কাবাসীরা মসজিদুল হারামের দিকে ছুটে আসেন।

এরপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিজয়লব্ধ সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। সাথে রয়েছেন বিশ্বস্ত সাথি হযরত বিলাল (রাঃ)!

মহানবীর (সাঃ) জন্য হযরত বিলালের (রাঃ) আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসার সীমা ছিলনা।

হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন ফজরের নামাযের পর হযরত বিলালকে (রাঃ) লক্ষ করে বললেন,

ঃ ওহে বিলাল, যেদিন রাত্রে আমি মে'রাজে গমন করেছিলাম ও আমার বেহেশতে প্রবেশ করার ভাগ্য হল, সেদিন আমার সামনে তোমার পাদুকার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি যেন দেখলাম, আমার আগেই তুমি বেহেশতে গিয়ে বসে আছ। বলত, মুসলমান হওয়ার পর, কী ভাল কাজ তুমি করেছ, যার ফলে তুমি এমন পুরস্কারের জন্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছ?

হযরত বিলাল (রাঃ) নম্রভাবে জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র নবী, আমি এসম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে যখনই আমি আযান দেই, তখনই আমি দু'রাকাত নামায পড়ে নেই। আর যখনই

অজু ভেঙে যায়, তখনই আমি আবারও অজু করে ফেলি ও সাথে সাথেই দু'রাকাত নফল নামায আদায় করি।

অন্য এক হাদীসে আছে হযরত বিলালের (রাঃ) প্রতি মহানবীর (সাঃ) ইচ্ছা ও আর্শীবাদ প্রকাশ পায় তাঁর একদিনের স্পষ্ট উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন, শেষ বিচারের দিন আমাকে বোরাক্বে (মিরায্ বা উর্ধ্বে আরোহণ করার রাত্রিতে ডানাবিশিষ্ট এক অশ্বরূপী বাহক যা মহানবীকে (সাঃ) মক্কার কাবাঘর সংলগ্ন 'হাতীম' স্থানটি থেকে জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল), আমার প্রিয় কন্যা ফাতিমাকে (রাঃ) আমার নিজ উটিনী আল্কাস্ওয়া এবং বিলালকে বেহেশতের এক উট বহন করে নিয়ে যাবে। নবীজি হযরত বিলালকে (রাঃ) সাইয়্যিদিনা (আমাদের নেতা) আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

একজন কাফ্রী ক্রীতদাসকে এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে বিভূষিত করে মানুষের কর্মের প্রতি যে মর্যাদা দেখানো হয়েছে তাতে মহানবীর (সাঃ) বিস্তৃত আকাশ-সম উদার মনের এবং ইসলামের সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং হযরত বিলালেরও (রাঃ) কর্মদক্ষতা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর (সাঃ) প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর আন্তরিকতা উপলব্ধি করা যায়।

# হযরত বিলালের (রাঃ) বিবাহ

হযরত বিলাল (রাঃ) জীবনের প্রথম থেকেই বহু দুঃখ কষ্ট, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। উমাইয়া ইবনে খালফের অধীনে দাসত্বের সময় তিনি মনিবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মনিবের গোত্রের উন্নতির জন্য বহু শ্রম ও সময় দিয়েছেন। প্রতিদানে কিছুই পাননি। না অর্থ, না ভাল ব্যবহার। এরপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অপরাধে মনিব ও তার নিযুক্ত লোকজনদের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য মহানবীর (সাঃ) সেবা করে তাঁর অত্যন্ত সুখের সময় অতিবাহিত হয়েছে।

এখন তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল। বিয়ে করে ঘর-সংসার করার কথা ভাবছিলেন। এ সময়ে তাঁর ভাই মদীনাতে এলেন। মদীনাতে এসে তিনি এক ইয়ামেন- পরিবারের পাত্রীকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। স্বগোত্রের লোক নয় বলে পাত্রীপক্ষ বিয়ে দিতে নারাজ হন। ভাই তখন হযরত বিলালের (রাঃ) পরিচয় দিলে তাঁরা বলেন, যদি হযরত বিলাল (রাঃ) আমাদের কাছে এসে বলেন যে বাস্তবিকই তিনি আপনার ভাই, তবেই আমরা আপনার কাছে মেয়ে বিয়ে দেব।

ভাইকে সাথে নিয়ে হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁদের কাছে এসে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ক্রীতদাস রাবাহ্‌র পুত্র এবং এই লোকটি আমারই ভাই। সে ধার্মিক ও সৎ। আপনাদের পছন্দ ও ইচ্ছে হলে এর সাথে আপনাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন।

জবাবে তাঁরা বললেন, হযরত বিলাল, আপনার মতো এমন একজন পুণ্যবান লোকের ভাইয়ের সাথে আমাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করব।

একদিনের কথা। হযরত বিলাল (রাঃ) তখন ইয়ামেনের মসজিদে ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, কে যেন তার কানে কানে ফিসফিস্ করে বলছে, বিলাল, এবার তুমি শাদি করে স্থিরভাবে বসবাস কর।

তিনি উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। সেখানকার খাওলান গোত্রের হিন্দ নামক একজন উপযুক্ত কুমারী কন্যার সন্ধান তিনি পান।

তিনি হিন্দের অভিভাবকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তাঁরা বলেন, তুমি কে? কী তোমার বংশ পরিচয়?

ঃ আমি আবিসিনিয়ার রাবাহ্‌র পুত্র বিলাল। আমার মা-বাবা ও আমি আমরা সবাই ক্রীতদাস ছিলাম। খুব গরিব ছিলাম আমরা। টাকা পয়সা কিছুই ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখন মহানবীর (সাঃ) সহচর হিসেবে আছি। আমার এখন আর্থিক সংগতিও হয়েছে।

শুনে তাঁরা তাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন লোককে খবরটা সত্য কিনা যাচাই করবার জন্য মহানবীর (সাঃ) কাছে মদীনাতে পাঠালেন।

তাঁদের প্রশ্নের জবাবে নবীজি (সাঃ) বললেন, হযরত বিলালের উপযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার তোমরা কে? কী করে একজন বেহেশতবাসী লোকের মূল্য কম করে নির্ণয় করছ?

শুনে সেই পরিবার হযরত বিলালের (রাঃ) সাথে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিজেদের গৌরব বাড়িয়েছিলেন। (হযরত বিলালের (রাঃ) বিবাহ সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়)।

# মহানবীর (সাঃ) মৃত্যুর পর হযরত বিলাল (রাঃ)

খয়বরের যুদ্ধে (৬২৮ খ্রিঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইহুদীদের পরাজিত করার পর একটা সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির পর তিনি যখন খয়বরে অবস্থান করছিলেন, যয়নাব নাম্নী এক ইহুদী রমণী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর ক'জন সাহাবীকে দাওয়াত করে। পাপিষ্ঠা যয়নাব, তাঁদের বিষ মেশানো খাবার পরিবেশন করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক টুকরা গোশত মুখে দিয়েই বুঝতে পেরে তা ফেলে দেন ও অন্যান্যদের তা খেতে বারণ করেন।

তিনি স্বাভাবিকভাবেই মদীনাতে ফিরে এলেন। কিন্তু ঐ বিষের ক্রিয়াই তাঁর অন্তিম রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর শরীর দিন দিন দুর্বল হ'য়ে যাচ্ছে দেখে হযরত বিলাল (রাঃ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

শরীরের ঐ অবস্থা নিয়েই তিনি সোয়ালক্ষ মুসলমানসহ হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। ৬৩২ খ্রিঃ ৭ই মার্চ। ১০ই হিজরী। এই হজ্বই তাঁর শেষ হজ্ব। এ সময়েও তিনি হযরত বিলালকে তাঁর বিশেষ সেবকরূপে মনোনীত করে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরাফাতের বিশাল ময়দানে তাঁর বিদায় হজ্বের মহামূল্যবান খুৎবা বা ভাষণের পরই তিনি হযরত বিলালকে (রাঃ) নামাযের জন্য আযান দিতে বলেছিলেন। এ সম্মান-এ সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে হয়? এ সৌভাগ্য হয়েছিল একজন হাবশি কেনা গোলামের যাকে কিনা তাঁর দৃঢ় ইমান যথার্থ গুণ ও যোগ্যতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগেও দুর্বল শরীরে মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে বিলালকে লোকদের ডেকে আনতে বলেছিলেন।

বিদায় হজ্বের আঠাশ দিন পর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা জুন ৬৩ বছর বয়সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন শ্রেষ্ঠ মানব নবী করিম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।

তাঁর মৃত্যুতে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে। হযরত বিলালের (রাঃ) পৃথিবী থেকে সব শান্তি, সব আনন্দ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল। উঠতে, বসতে সারাক্ষণ থাকতেন নবীর (সাঃ) পাশে পাশে। নবীবিহীন হযরত বিলাল (রাঃ) মর্মবেদনায় অস্থির হয়ে ওঠেন। মদীনার পথ ঘাট, বাসস্থান, মসজিদে নববী, অলিগলির পরতে পরতে শুধু নবীর (সাঃ) স্মৃতি। কোনো কাজে আর উৎসাহ পান না। মনটা কেবলই হাহাকার করে ওঠে। আযানের সুরেও যেন কান্না ঝরে। নবীর ব্যথায় শেষ পর্যন্ত

তিনি আযান দেয়াই ছেড়ে দিলেন। হায় আল্লাহ্! আমার পেয়ারা নবী ছাড়া আমি যে এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছি না! তার ভেতরে কেবল এ কথাটাই অনুরণিত হতে থাকে।

এখন থেকে তাহলে বাকি জীবনটা ধর্মযুদ্ধেই কাটিয়ে দেব!

মনস্থির করে ফেললেন হযরত বিলাল (রাঃ)। মুসলিম জাহানের নব নির্বাচিত প্রথম খলিফা, তাঁর বন্ধু ও মুক্তিদাতা হযরত আবুবকরের (রাঃ) কাছে তার মানসিক অবস্থা ও আন্তরিক ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন, একজন মুসলমান সবচেয়ে ভাল কাজ যা করতে পারে তা হ'ল পবিত্র যুদ্ধে যোগদান করা। আমার আন্তরিক ইচ্ছে, আমি আমার জীবনের পরবর্তী সময়টুকু পবিত্র ধর্মযুদ্ধের কারণে ব্যয় করব।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি আরো কিছুদিনের জন্য মদীনায় থাকুন। আমি এখন বৃদ্ধ। আপনার সাহায্য আমার খুবই দরকার। হযরত আবুবকরের (রাঃ) কথায় হযরত বিলাল (রাঃ) বেশ বিচলিত হলেন। এই আবুবকরই (রাঃ) তাকে অসহ্য নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছিলেন! নিজের অর্থ দিয়ে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন! মহানবীর (সাঃ) কাছে তিনিই তাকে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার বন্ধু ছিলেন।

তাই তো! তিনি কী করে হযরত আবুবকরকে (রাঃ) ছেড়ে যান! তিনি তাঁর সাথেই রয়ে গেলেন। ঠিক করলেন, যতদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) খলিফা থাকবেন, ততদিন আর ধর্মযুদ্ধে যাবেন না। হযরত আবুবকরের (রাঃ) জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁর সব রকম কাজে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

হযরত আবুবকরকে (রাঃ) তিনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। খলিফা আবুবকর তাঁর রাজত্বকালে নানান রকম ধর্মীয় বিপদ আপদ থেকে আরবে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় মদীনার কয়েকজন মুসলমান খলিফার মহৎ কার্যাবলীর প্রশংসা করছিলেন।

তাঁরা বলছিলেন, নবী করিম (সাঃ) ছাড়া আর কেউ হযরত আবুবকরের (সাঃ) মতো ইসলামের জন্য এত ভাল কাজ করেননি এবং এত অধিক আত্মত্যাগও করেননি।

একজন বলে উঠলেন, কিন্তু একজন আছেন যিনি ইসলামের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, হযরত আবুবকরের মতো কিংবা তার চেয়েও

বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, কে তিনি?

ঃ তিনি হলেন, আবিসিনিয়ার রাবাহ্র পুত্র হযরত বিলাল (রাঃ)। ধর্মের জন্য তিনি খুবই নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

একজন প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু আমাদের খলিফাও কি বিধর্মীদের হাতে নির্যাতিত হননি? তাঁকে কি মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলা হয়নি?

ঃ সে কথাও সত্যি। বললেন একজন, হাজার হলেও তিনি ছিলেন একজন গোত্রের লোক। গোত্রের লোকেরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকতেন। বিধর্মীরা তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলেও, একেবারে মেরে ফেলার সাহস ছিল না। মারলে লোকেরা তাদের ছেড়ে দেবেনা সেটা তারা ভালভাবেই জানত। অন্য -দিকে হযরত বিলালের (রাঃ) গোত্রের একটা লোকও ছিলনা যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

অন্য একজন দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, এক কথায় বলতে গেলে, বলতে হয়, ইসলামের প্রথম যুগে হযরত বিলালই (রাঃ) কোরাইশদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

এ সময়ে হযরত বিলাল (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন,

ঃ আপনারা কী বিষয় নিয়ে এত গুরুগম্ভীর আলোচনা করছেন?

জবাবে একজন বললেন, আপনার প্রশংসা করা হচ্ছিল এবং আপনার গুণাবলীর পরিমাপ করা হচ্ছিল।

ঃ আমার গুণাবলী! হযরত বিলাল (রাঃ) অবাক হয়ে বললেন, আমি তো আবিসিনিয়ার একজন ক্রীতদাস ছিলাম, আর একজনের দয়ায় আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।

তাঁদের মধ্যে একজন খুব উৎসাহের সাথে বললেন, কেউ কেউ গুণের বিচারে আপনাকে হযরত আবুবকরের (রাঃ) চেয়েও উঁচুতে স্থান দিয়েছেন।

শোনা মাত্র হযরত বিলালের (রাঃ) মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি খুবই রেগে গেলেন। বললেন, কী করে মহৎ হযরত আবুবকরের (রাঃ) সাথে কেউ আমাকে তুলনা করে, যেখানে আমি তাঁর অসংখ্য ভাল কাজের মধ্যে একটি- আমার দাসত্ব থেকে মুক্তি!

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সবাই হযরত আবুবকরের সাথে হযরত বিলালকে (রাঃ) মহান একজন ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করলেন।

# হযরত বিলালের (রাঃ) ধর্মযুদ্ধে যোগদান ও পরবর্তীতে সিরিয়ার গভর্ণরের পদ লাভ

হযরত আবুবকরের পরে হযরত উমর (রাঃ) যখন খলিফা হলেন হযরত বিলাল (রাঃ) তাকেও রাজ্যের সব রকম কাজে সাহায্য করতে থাকেন। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, "হযরত আবুবকর (রাঃ) আমাদের প্রধান নেতা এবং তিনি আমাদের অন্য একজন নেতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, হযরত উমর (রাঃ) কার সম্বন্ধে এই উক্তি-টি করেছিলেন? হযরত উমর (রাঃ) বাস্তবিকই হযরত বিলালকে (রাঃ) নেতার আসনে বসিয়ে তাঁকে তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

একদিন খলিফা উমর (রাঃ) কোনো কারণে হযরত বিলালকে (রাঃ) তাঁর অফিসে ডেকেছিলেন। বাইরের ঘরে তখন কয়েকজন কোরাইশ সরদারও হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হযরত বিলালকেই (রাঃ) খলিফা উমর (রাঃ) প্রথমে ডেকে পাঠালেন। এতে সরদারেরা খুব চটে গেলেন।

কী! আমরা হলাম সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক! আমরা হলাম নেতা! আর বিলাল হল কাফ্রী কেনা গোলামের ছেলে গোলাম। তাকে এমন সম্মানের সাথে আগে ডাকার কী মানে আছে?

ঃ মানে অবশ্যই আছে, বললেন, কোইরাশ নেতা বিদ্রোহী আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা। আল্লাহর নবী (সাঃ) আমাদের সকলকে সত্যের পথে ডাক দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর সে ডাকে সাড়া দিয়েছি অনেক দেরিতে। যাঁরা আগে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদেরই এখন আগে ডাকা হবে, এ নিয়ে আমাদের এখন রাগে গজগজ করা মোটেই উচিত নয়।

কিছুদিন অতিবাহিত হল। হযরত বিলালের (রাঃ) মন ধর্মযুদ্ধে যাবার জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠে। হযরত উমরের (রাঃ) কাছে তাঁর ধর্মযুদ্ধে যাবার আন্তরিক ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে যুদ্ধে না গিয়ে দেশে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হযরত বিলাল (রাঃ) কিছুতেই আর ঘরে থাকতে রাজি নন। সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহীদীনদের সাথে মিলিত হতে চাইলেন। অগত্যা হযরত উমর (রাঃ) তাঁর যুদ্ধে যাবার

অনুরোধ মেনে নিলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) সিরিয়া অভিযানে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সাধারণ সৈনিক হিসেবে নয়, সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর প্রধানরূপে কাজ করেন। জেরুজালেম তাঁদের দখলে আসে।

হযরত উমর (রাঃ) প্রতিরোধকারীদের সাথে নিয়ে একটা শান্তিচুক্তিতে নিজে সই করতে আসেন। হযরত উমর (রাঃ) যখন পবিত্র জেরুজালেমে প্রবেশ করেন, তাঁর পাশে পাশে চলছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)।

খলিফা উমর (রাঃ) যখন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক থেকে শেষ বারের মতো বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, সেখানকার জনসাধারণ ও প্রধানগণ হযরত উমরের (রাঃ) কাছে আবেদন করলেন,

ঃ মহামান্য খলিফা, আপনার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ, হযরত বিলাল (রাঃ) যেন শেষবারের মতো আমাদের এখানে একবার আযান দেন।

হযরত উমর (রাঃ) তাঁদের কথামতো হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) বিনয়ের সাথে বলেন, হে বিশ্ববাসীদের নেতা, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মৃত্যুর পর আমি মনস্থির করেছিলাম যে আর কোনোদিন কারো জন্যে আযান দেব না। কিন্তু আজ আমি শুধু আপনার আদেশ ও কথা রাখার জন্যই আযান দেব।

হযরত বিলাল যখন তাঁর, মধুর, উচ্চনিনাদী কণ্ঠে মুসলমানদের নামাযে আসার জন্য আহবান করলেন, সবার মনে তখন নবীজির (সাঃ) কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বুকে ব্যথার ঢেউ ছলকে ওঠে। তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। হযরত উমরও (রাঃ) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

সিরিয়ায় সার্থক অভিযানের পর হযরত বিলাল স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য সেখানে থেকে, গেলেন। সিরিয়া বিজয়ে যুদ্ধে বহু গণিমত তাঁর হাতে আসে। সেসব তিনি সংসারের জন্য খরচ না করে, ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর আন্তরিক কর্মক্ষমতার গুণে তিনি দামেস্কের গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

সিরিয়ায় বসবাস করার সময় এক রাত্রে হযরত বিলাল (রাঃ) প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে (রাঃ) স্বপ্নে দেখা পেলেন। নবীজি (সাঃ)

তাঁকে বলছেন, বিলাল! এটা কিরকম যে এতগুলো বছর কেটে গেল, তুমি আমার সাথে দেখা করতে এলেনা?

এ স্বপ্ন হযরত বিলালকে (রাঃ) অস্থির করে তুলল। সকাল হবার সাথে সাথেই তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করেন। নবীজির (সাঃ) কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে ভাসালেন। তাঁর জন্য প্রাণ ঢেলে আন্তরিকভাবে দোয়া করেন। নবীর (সাঃ) পাশে পাশে তাঁর অবস্থান... তাঁর স্নেহধন্য মধুর সেই দিনগুলো .. স্মৃতির পর্দায় একটার পর একটা ভেসে ওঠে। অতীত যেন বাস্তব হয়ে উঠে এসেছে। হযরত বিলাল (রাঃ) একটা আনন্দভরা-সুখী জগতে হারিয়ে গেলেন।

বাস্তবে ফিরে এসে দেখেন রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) দুই নাতি হাসান ও হোসেন তাঁর অতি কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না হযরত বিলাল (রাঃ) ।

তাঁদের গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় তিনি কাঁদতে থাকেন।

কান্না থামলে হাসান ও হোসেন দুজনেই আবদার করলেন,

ঃ হযরত বিলাল (রাঃ)! কত দিন ধরে আমরা মদীনাবাসীরা আপনার মধুর স্বরের আযান শুনিনা। দয়া করে আপনি আগামীকাল ফজরের আযান দিলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব, ধন্য হব।

হযরত বিলাল (রাঃ)! তাঁর প্রাণপ্রতিম নবীর (সাঃ) নাতিদের অনুরোধ কী করে রক্ষা না করে পারেন?

পরদিন ঊষার আলো ফুটবার আগেই হযরত বিলাল (রাঃ) মসজিদে নববীর ছাদ থেকে আযান দিতে থাকেন। আযানের মোহময় মধুর স্বর মদীনার অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আর আকাশ -বাতাস মুখরিত করে তোলে। অনেক বছর পর নবীজির (সাঃ) যামানার স্বর শুনে সারা মদীনায় এক মর্মস্পর্শী শোকের ও কান্নার রোল পড়ে যায়। প্রিয় নবীর (সাঃ) সব স্মৃতি তাঁদের মনে পড়ে যায়। তাঁরা মসজিদে নববীর দিকে ছুটে আসেন। এমন কি আনসার ও মুহাযিরদের পর্দানশীন স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে মসজিদের দিকে চলে আসেন। হযরত বিলালকে (রাঃ) দেখে নবীর (সাঃ) জন্য তাঁদের শোক যেন হাজার গুণ উথলে ওঠে।

এই দিনের ঘটনাটি বহুদিন পরেও মদীনা নগরীতে স্মরণীয় হয়েছিল।

# চরিত্র

একজন নির্যাতিত ক্রীতদাস থেকে হযরত বিলাল (রাঃ) নিজের আন্তরিকতা, যোগ্যতা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের বলে সম্মানের অত্যন্ত উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

রাসূলে করিম (সাঃ) তাঁকে সারা মুসলিম জাহানের প্রথম মুযায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি তাঁকে 'খাজিন' বা হিসাবরক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর এবং তাঁর পরিবার ও অতিথি মুসাফিরদের আহারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তিনি নিশ্চিতরূপে হযরত বিলালের (রাঃ) ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে অনেক সময়ই তিনি মহানবীর (সাঃ) সেনাবাহিনীর সহকারী কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন। শেষ পর্যায়ে তিনি সিরিয়ার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তাঁর এই আকাশ ছোঁয়া সম্মান ও পদোন্নতিতে অনেক কোরাইশ নেতা ও প্রধানদের কাছে তিনি রীতিমতো হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রে বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্য দেখা যায়নি। উচ্চপদ বা নেতৃত্ব তো দূরের কথা, মহানবীর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে থেকেও তিনি কোন অহংকার করেননি। সব রকম কাজ আন্তরিকতার সাথে করতে পছন্দ করলেও, একজন ধর্মযোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তিনি একজন বিনয়ী সৈন্য হ'তে চাইতেন। কেউ তাঁর সামনে প্রশংসা করলে, তিনি খুব বিব্রত বোধ করতেন। বলতেন, না, আমি তেমন কিছুই নই। আমি আবিসিনিয়ার একজন ক্রীতদাসের সন্তান এবং আমি নিজেও ছিলাম একজন ক্রীতদাস। মহান আল্লাহ্তায়ালা আমাকে সৎ পথে চলার দিক্ নির্দেশ করেছিলেন, আর আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) যখন দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, অসহ্য নির্যাতনে জর্জরিত ছিলেন, তখনও তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য, দায়িত্বশীল, সৎ, আন্তরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) ভালভাবে উপলব্ধি করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হ'য়েই তিনি তাঁর বিশ্বাসে হয়েছিলেন ইস্পাতের

মতো শক্ত। আল্লাহ্‌র কালাম মুখে আনার জন্য তিনি যত অধিক অত্যাচারিত হয়েছিলেন, বিশ্বাসে ততই তিনি পবিত্র ও দৃঢ় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্য সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন।

তাঁর উচ্চনিনাদী, আবেগময়, মধুর স্বরের আযান ধ্বনির তুলনা হয় না। তাঁর আযান শোনার জনা মুসুল্লিগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক। কোনো অবস্থাতেই তিনি মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের (রাঃ) নিঃস্বার্থ উপকার এবং তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কথা ভুলে যেতেন না। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মৃত্যুর পর শোকাহত হযরত বিলাল (রাঃ) মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে তিনি ধর্মযুদ্ধেই যোগদান করবেন।

কিন্তু হযরত আবুবকরের (রাঃ) অনুমতি নিতে গেলে যখন তিনি বললেন, আমি এখন বৃদ্ধ, আপনার সাহায্য আমার খুবই দরকার। কৃতজ্ঞতাবোধে তিনি যুদ্ধে যাওয়া স্থগিত রেখে মদীনাতে থেকে গেলেন।

স্পষ্ট বক্তব্য রাখা বা ইচ্ছে প্রকাশ করা ছিল তাঁর চরিত্রের একটা সরল দিক। অসহ্য নিপীড়ন থেকে হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন, তিনি তাঁর মুক্তি দাতাকে বিনম্র স্বরে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে আপনার নিজের কাজের জন্য কিনে থাকেন, তবে আপনি আমাকে আপনার বাড়িতে রেখে দিন। আর যদি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তা করে থাকেন তবে আমাকে সেভাবেই ব্যবহার করবেন আশা করি (বোখারী)।

প্রথম খলিফা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্‌র খাদেম নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। মহানবীর (সাঃ) সাহচর্যে থেকে হযরত বিলাল (রাঃ) যেন বেহেশতে অবস্থান করার আনন্দ পেতেন। নবীর (সাঃ) ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন বলে তিনি সারা পৃথিবীতে অত্যধিক উচ্চ মর্যাদা পেয়েছিলেন।

# হযরত বিলালের (রাঃ) মৃত্যু

স্বপ্নে নবীর (সাঃ) আদেশ পেয়ে হযরত বিলাল (রাঃ) মদীনায় এলেন। তাঁর ও হযরত আবুবকরের (রাঃ) কবর যিয়ারত করলেন। নবীজির (সাঃ) নাতিদের অনুরোধে মসজিদে নববী থেকে আযান দিলেন। নবীর (সাঃ) স্মৃতিতে মদীনাবাসীদের ক্রন্দনে হযরত বিলাল (রাঃ) মানসিক বেদনায় অত্যধিক অস্থির হয়ে, দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তিনি মদীনা ত্যাগ করেন।

বেশ কিছু দিন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজে পান না। আবার ছুটে যান মদীনাতে। বন্ধু ও মুক্তিদাতা হযরত আবুবকরের কথাও ভীষণভাবে মনে পড়ে।

মহানবী (সাঃ) ও হযরত আবুবকরের (রাঃ) প্রতি হযরত বিলালের (রাঃ) যে আনুগত্য এবং গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তা প্রকাশ পায় পরপারে তাঁদের সাথে মিলিত হবার জন্য মৃত্যুকে তিনি কীভাবে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

শেষবারের মতো মদীনাতে মহানবী (সাঃ) ও হযরত আবুবকরের (রাঃ) কবর যিয়ারত করে সেখান থেকে হযরত বিলাল (রাঃ) ফিরে এলেন দামেস্কে। এসেই অসুস্থ হ'য়ে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

স্ত্রী ডুকরে কেঁদে ওঠেন- ওয়া কারবাহ্! হায়রে আমার বুক ভেঙে যাওয়া দুঃখ রে!

স্ত্রীর আর্তবিলাপে এক মুহূর্তের জন্য হযরত বিলাল (রাঃ) চোখ মেলে তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, ওয়া ফারহাতাহ্! ওহ! কী আমার আনন্দ রে! আমি আমার অতি প্রিয়জনদের কাছে যাচ্ছি -নবীজি (সাঃ) ও তাঁর সাথিদের কাছে! এই তাঁর শেষ কথা। তিনি চিরদিনের জন্য এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) যাঁর দেশ ছিল আবিসিনিয়ায়, যিনি জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন মক্কায়, অভিবাসী হ'য়ে উন্নতি লাভ করেছিলেন মদীনায়,বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন সিরিয়ায় আর মৃত্যুবরণ ও কবরস্থ হ'য়েছিলেন রাজধানী দামেস্কে।

এই মহান ব্যক্তির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে তথ্যের কিছুটা গরমিল দেখা যায়। হিজরীর ১৭, ১৮, ২০ বা ২১ হিজরীতে (৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪১ বা ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে বিভিন্ন জন, বিভিন্ন সন - তারিখ উল্লেখ করে থাকেন।

তাঁর সমাধিস্থান সম্বন্ধেও একেক জন একেক স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন আলেপ্পো বা দারাইয়াতে তাঁর কবরস্থান। কিন্তু অধিকাংশের এবং ঐতিহাসিক ইব্নে সায়াদের মতে-হযরত বিলাল (রাঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে খাওলানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আর তখনকার দামেস্কের মাযার শরীফ বাব্-উস্ সাগীরের মাটিতে তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন।

# হযরত বিলালের (রাঃ) মসজিদ

হযরত বিলালের (রাঃ) মৃত্যুর পর মহানবীর (সাঃ) প্রতি তাঁর অত্যধিক ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধার স্মৃতি রক্ষার্থে বাইতুল্লাহ্‌র কাছেই সুউচ্চ আবু কোবায়েস পাহাড়ের চূড়ায় একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। এটি 'হযরত বিলালের (রাঃ) মসজিদ' নামে পরিচিত।

ছোট্ট মসজিদ। ধবধবে সাদা । পেছনে বিস্তৃত নীল আকাশ। মনে হয় যেন আকাশ থেকে নেমে এসে আলতোভাবে মাটি ছুঁয়ে আছে।

হেরেম শরীফে যাবার পথে এই মসজিদটি সবারই নজরে পড়ে। একদিন এই মসজিদটির কাছে গিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে বিষয়ে তোমাদের কিছু না বললে, অন্তত আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

সে ১৯৭৭ সালের কথা। আমি আমার স্বামী ডাঃ এ,আর, খানের (বর্তমানে মরহুম) সাথে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা ও জেদ্দাতে গিয়েছিলাম। মসজিদুল হারামের কাছে যে সাফা পাহাড় রয়েছে, তার ঠিক উলটো দিকে অন্য একটি পাহাড়ের ওপর রয়েছে এই মসজিদ।

একদিন আছরের নামাযের পর আমরা দু'জন হযরত বিলালের (রাঃ) মসজিদ দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

অনেক বছর আগে সাফা ও আবু কোরায়েস পাহাড় দু'টো একসাথে লাগা ছিল। পরে ডিনামাইটের সাহায্যে দু'পাহাড়ের মধ্যের পাথর ভেঙে, পাকা সড়ক তৈরি করা হয়েছে।

নিচের সমতল রাস্তা থেকে গাড়িতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওপরে ওঠা যায়। আবার পুরনো সিঁড়ির পথ ধরেও চলা যায়। আমরা গিয়েছিলাম সিঁড়ির পথে, পায়ে হেঁটে।

ধাপে ধাপে রয়েছে একতলা, দোতলা, বহুতলা বাড়ি-ঘর। দোকান-পাটও রয়েছে। রয়েছে কিছু সমতল জমি। বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় নিম ও বাবলা জাতীয় গাছ।

সদর রাস্তা ছেড়ে সামান্য একটু মোড় ঘুরে আবু কোরায়েস

পাহাড়ের পথ ধরেছি আমরা। কয়েকটা বাড়ির লোহার গেইটের সামনে দিয়ে, কয়েকটা বাড়ির পেছন দুয়ারের কাছ ঘেঁসে, কিছুটা খাড়া পাহাড়ের পাথুরে এক পথ ধরে চলছিলাম। খুব সাবধানে চলতে হয়। যে পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠেছে এ মসজিদ, শুনেছি এ পাহাড় অনেক কারণে বিখ্যাত।

প্রথমত, কাবা ঘর ভেঙে গেলে, ফের ভালভাবে যখন তৈরি করা হ'ল, তখন আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই জাবলে আবু কোবায়েসে অর্থাৎ আবু কোবায়েস পাহাড়ে উঠেই লোকদের হজ্ব করবার জন্য ডেকেছিলেন। তাছাড়া বিখ্যাত পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এই পাহাড়েই বাস করতেন বলে কথিত। আর এখানেই তৈরি হল হযরত বিলালের (রাঃ) মসজিদ।

বেশ কয়েকটা ধাপ পার হ'য়ে একটা ছোট সমতল জায়গায় এসে পৌঁছেচি। ফরসা, সুন্দর, ছোট ক'জন ছেলেমেয়ে খেলা করছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত ছেলেদের লম্বা কামিয- আবাকাবা , আর মেয়েরা পরেছে রংচঙে সুন্দর ম্যাক্‌সি।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চারদিকে এখন বিজলিবাতির ঝলসানো আলো। আমরা এবার বেশ বড় বড় চওড়া সিঁড়ির পথ ধরে ধাপে ধাপে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। শব্দহীন পথ। শেষ ধাপেই হযরত বিলালের (রাঃ) মসজিদ।

বাঁ পাশে বেশ সরু খোলা একটি প্রবেশ পথ। সেখান দিয়ে আমরা সরাসরি মসজিদের আঙ্গিনায় উঠে এলাম। মাগরিবের নামাযের পর মসজিদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ফের খোলা হবে এশার নামাযের আগে।

দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের অনেকটা অংশ নযরে পড়ে। সারা ঘর জুড়ে বিছানো রয়েছে সাধারণ কার্পেট। দু'পাশে কাঠের তাক ও আলমারি। তাকে সাজানো কোরান-শরীফ দেখে মনে হয়, কী সাধারণ এক মসজিদ, অথচ কী অসাধারণ তার ফজিলত!..... মনে পড়ে, মক্কার লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে মহানবী (সাঃ) মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। ...... দশ বছর পর বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করে, প্রায় দশ হাজার সঙ্গি সাথি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন মক্কায়। মক্কাবাসীরা নিজেদের অন্যায়ের কথা ভেবে ভয়ে অস্থির। ভয়ে তাদের সেকী ছুটোছুটি! কোথায় পালাবে! পালিয়ে

জানটা বাঁচাবে! কিন্তু ক্ষমার সাগর মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন, লা তাছরীবা আ'লাইকুমুল্ ইয়াওমা! অর্থাৎ আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। আজ প্রতিশোধ নেবার দিন নয়! শুধু ক্ষমা, আর ক্ষমার দিন! তিনি আরো ঘোষণা করলেন, যারা কাবা ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা অস্ত্র সম্পর্ণ করে নিজ ঘরে বসে থাকবে তারাও নিরাপদ। এমনিভাবে যারা হযরত বিলালের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াবে তাদেরও কোনো বিপদ থাকবে না। একটা কাপড়ের নিশান রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বিলালের (রাঃ) হাতে তুলে দিলেন। তিনি সেই নিশান নিয়ে এসে দাঁড়ালেন এই পাহাড়ের ওপর, যেখানে আজ আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছি।

এমনিভাবে একজন কাফ্রী ক্রীতদাসকে মর্যাদা দেয়া হ'ল তাঁর গুণ, ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে, বংশ দেখে নয়। ক্রীতদাসের প্রতি এই যে সম্মান প্রদর্শন তা পৃথিবীতে আগে কখনো দেখা যায়নি।

---